দৈনিক খবর

02 NOV 1991

তারিখ 02 NOV 1991 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ঃ মূল উৎস কোথায়?

আলহাজ্ব শামস্-উল হুদা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যা ঘটছে তা নিয়ে কিছু না লিখলেই নয়। আবার লিখেও যে খুব একটা বিরাট কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হবে তা মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের আর্মড ক্যাডারদের উপস্থিতি আমাদের অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। অস্ত্র সংরক্ষণ ও অস্ত্র ব্যবহারের এমন ঘটনা অতীতে আর কোনদিন শুনিনি।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের অনেক তরুণের হাতে অস্ত্র থেকেই যায়। হাতে অস্ত্র রাখার মোহ তারা যেন ত্যাগ করতেই পারছিল না। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর আহবানে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের দলভুক্ত যুবকরা তাদের অস্ত্র বঙ্গবন্ধুর কাছে জমা দেয়। অন্যেরা কিন্তু তাদের অস্ত্র জমা দিতে গড়িমসিভাব অব্যাহত রাখে। বামপন্থীদের একটি অংশ তখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা ভাবছিল। তখনও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। এখন তো ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি একেবারেই অস্বাভাবিক। ছাত্ররা কেন হাতে অস্ত্র রেখেছে- এ প্রশ্নটির জবাব নেই। কেউ এ প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পায় না। আমরা লিখি, ছাত্রদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ ইত্যাদি সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু কেন এরকম ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

দিন যায়, দিন আসে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যা ঘটছে এর পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা আমরা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করি না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, আমরা সবাই গড্ডালিকার মতো চলছি। আমাদের পরিণতি কি হবে তা ভেবে পাই না। কোন মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার পিছনে অনাবিল আনন্দ আছে। যুগ যুগ ধরে এরকম আত্মত্যাগের ঘটনা মানুষ স্মরণ করবে।

আমাদের সকলেরই ধারণা, রাজনৈতিক দলগুলো যদি একটি ঐকমত্যে আসতে পারে তাহলে এ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। কয়েকদিন আগে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ী ভাঙচুর করার বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়া কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এসব অনাচার সহ্য করা হবে না। সরকারের পক্ষ থেকে এরকম উচ্ছৃংখল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কিছুই হলো না। শেষ পর্যন্ত এরকম হুঁশিয়ারি উচ্চারণের তিন দিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলাগুলীর মহড়া প্রদর্শিত হয়। এ রকম ঘটনায় আইন-শৃংখলার প্রতি আনুগত্য রয়েছে এমন নাগরিক উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারে না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাসদ- এই কয়েকটি দল নিজেদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনে এগিয়ে আসলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হবে আশা করা যায়। বিশৃংখলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনাগোনা করলে কিছুতেই সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসে কোন আনন্দ নেই। সন্ত্রাসের শেষ পরিণতি কি- তা সংশ্লিষ্ট সকলকেই ভেবে দেখতে হবে। জীবন-মৃত্যু নিয়ে হাসি-তামাশা চলে না। এখন আমরা যা করছি তা হাসি-তামাশা ছাড়া অন্য কিছু নয়। দেশের যুবক সম্প্রদায়কে আমরা অহেতুক মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিতে পারি না। এই হত্যাকান্ড যেভাবেই হোক বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে এক সাথে বসে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গত বুধবার জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ (আ-অ)'র সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "কিন্তু জানতে চাই এরপর সেখানে সন্ত্রাস বন্ধ হবে কি-না। আমি উত্তরবঙ্গের মানুষের দুরবস্থা দেখতে গিয়েছিলাম। অথচ ঢাকার রাস্তায় আমার রক্ত চাওয়া হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস যদি আমার রক্ত দিয়ে বন্ধ হয় তাহলে আমি রক্ত দিতে রাজি আছি।" জাতিকে আর কত লাশ টানতে হবে জানতে চেয়ে তিনি বলেন, "এ ছাত্রহত্যা এবং সন্ত্রাসের জন্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী দায়ী। হত্যাকারীদের বিচার হলে সন্ত্রাস হতো না। অথচ তাদের ধরা হলে পুলিশ কর্মকর্তাদের সাসপেন্ড বা বদলী করা হয়।" বিরোধী দলীয় নেত্রী এ পর্যায়ে তাঁর দলে মিলন হত্যার সাথে যুক্ত কেউ নেই উল্লেখ করে বলেন, আমাদের সাথে থাকলে বহিষ্কার করতাম। দ্বাদশ সংশোধনীর পর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছেন, এ ঘোষণা প্রদান করলে যৌথ বিবৃতি প্রদানে তিনি অবশ্যই রাজি আছেন বলে জানান।

সংসদে শেখ হাসিনার উল্লেখিত বিবৃতিটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি যা বলার তা বলে দিয়েছেন। তিনি কোন কথা গোপন করেননি। সন্ত্রাসীদের কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না, তা আমরাও জানতে চাই। যে সব হলে ছাত্রদলের আধিপত্য রয়েছে সেই হলগুলোতে তল্লাশী চালানো হয়নি। কেন তল্লাশী চালানো হলো না- এ প্রশ্ন গণমনে দেখা দিয়েছে।

অপরপক্ষে, সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বক্তব্যে সেই পুরানো দিনের গতানুগতিক ধারা পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে নতুন কিছু নেই। ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী কাল্পনিক স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এখনো তিনি এই আতংকে ভুগছেন। জনাব চৌধুরী বলেছেন, "স্বৈরাচারের পতন যখন আসন্ন হয়ে উঠেছিল, তখন একবার ছাত্রদল-ছাত্রলীগের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঁধানো হয়েছিল। স্বৈরাচারের পক্ষের দেশী ও বিদেশী শক্তি সেই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী।" তিনি সতর্ক করে বলেন, "সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরেকটি ষড়যন্ত্র যে শুরু হয়নি, তা কে বলবে?" ডঃ বদরুদ্দোজার বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, আমরা বোধ হয় মুসলিম লীগ জামানায় বসবাস করছি। সেই কাল্পনিক অপদেবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর কতদিন চলবে? বেগম খালেদা জিয়া বেশ কয়েকবার বলেছেন, তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। কারা তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন তা খোলাসাভাবে বললে খুশী হবো। কেননা, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী দেশী ও বিদেশী যে ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন তাতে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ছাত্রদলের বক্তব্যে রীতিমত উস্কানি আছে। গত বুধবার প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্রদলের এক সমাবেশে নেতারা বলেন, "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং তাই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজির অবসান চাই। প্রশাসন ও পুলিশ এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে আমরা সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা ও পরিচালনাকারীদের ঘেরাও করবো, এমনকি ৩২ নম্বরে সন্ত্রাসীরা আশ্রয় নিলে সেই বাড়ী ও বিরোধী দলের নেত্রীর বাসভবন ঘেরাও করা হবে। প্রয়োজনে আমরা অনশন ধর্মঘট করবো।"

ছাত্রদলের বক্তব্য পাঠ করার পর আমার মনে এরকম ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আসলে এসব ছেলেপেলে দেশে নৈরাজ্য চায়। তাদের বক্তব্যে উত্তেজনা রয়েছে। ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি'র যে সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা এরকম বক্তব্যে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। যা খুশী তা বলতে বারণ নেই সত্য কিন্তু লাগামহীন বক্তব্যের পরিণতি কোন দিনই শুভ হয় না। ছাত্রদলের বক্তব্যে জাতীয়তাবাদী শক্তি নিজের সংহতি হারিয়ে ফেলবে। অন্যেরা কখন এসে তাদের ক্ষতি করবে- এজন্যে চিন্তাক্লিষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। তারা নিজেরাই অহরহ তাদের ক্ষতি করছে। এই সত্যটুকু যদি ছাত্রদলের নেতা ও কর্মীরা অনুধাবন করতেন তাহলে আমরা খুশী হতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সম্পর্কে সরকার সেদিন রাতে দু'টো প্রেসনোট জারি করেছেন। প্রথম প্রেসনোটটিতে বলা হয়েছিল, "একশ্রেণীর উচ্ছৃংখল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।" পরের প্রেসনোটটিতে বলা হয় যে, "ছাত্রলীগের ছেলেরা ছাত্রদলের ছেলের ওপর গুলীবর্ষণ করে।" প্রশ্ন হলো, প্রেসনোটে কোনদিনই কোন সংগঠনের নাম এভাবে উল্লেখ করা হয় না। কারণ প্রেসনোটটি হচ্ছে একটি ইমপারসনাল ব্যাপার। এখানে কোন দলকে, কোন গোষ্ঠীকে বা কোন ব্যক্তিকে ঘটনার জন্য দায়ী করা চলে না। প্রেসনোটে শুধু ঘটনার বিবরণ থাকে। আমরা প্রেসনোটের বক্তব্যকে খাঁটি বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। অথচ সরকার চিরাচরিত নিয়ম ও ঐতিহ্য ভঙ্গ করে প্রেসনোটে প্রত্যক্ষভাবে একটি ছাত্র সংগঠনের নাম উল্লেখ করেছে। এ ঘটনা আমাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা বটে। সরকারের উচিত ছিল পরের প্রেসনোটটি বাতিল করে দেয়া। অনেকে বলছেন, প্রেসনোট জারির মধ্যেও নতুনত্ব আছে। যতই এতে নতুনত্ব থাক না কেন কাজটা যে মোটেও ভাল হয়নি তা আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে।

এতদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদলের একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ন ছিল। ছাত্রদলের ভয়ে সবাই লেজ গুটাতো। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে ছাত্রদলের বাক্সে ভোট দিতো। এখন কিন্তু এরকম অবস্থা আর বিদ্যমান নেই। বলা চলে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ছাত্রলীগের নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে বলে মনে হয়। আসলে 'টিলটি দিলে পাটকেলটি খেতে হয়।'

বেগম খালেদা জিয়া এসব কথা অনুধাবন করতে পারেন না। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন, কাজেই কোথায় কি ঘটছে- সবকিছু তাঁর জানা আছে। পুলিশ ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে সন্ত্রাস দমন করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

শিক্ষাঙ্গন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে অতীতে আমরা বহুবার লিখেছি, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এই কারণে এ সম্পর্কে আর লিখতে ইচ্ছা করে না। প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে যেভাবে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাতে কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে পারি না। যা সত্য তা পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন। তাই পরিষ্কারভাবে বলতে হচ্ছে, "কতিপয় রাজনৈতিক দল নিজেরাই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার স্থলে অস্ত্রভিত্তিক প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন দলের আদর্শ ও প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রবাজির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।" নিবন্ধে আরো লিখেছিলাম "অনেক সময় বলা হয় যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য কিছু বহিরাগত দায়ী। একথাটি বলা সহজ। বহিরাগতরা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে? কারা তাদের মদদ যোগায়? আসলে বহিরাগতরা আসে আকুলিয়ারী ফোর্স হিসেবে। কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ও দায়িত্ব এদের নেই। বলা যায়, এরা ভাড়াটে মাস্তান। এই ভাড়াটে মাস্তানরা শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ব্যাহত করছে- এমন একটি অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ বহিরাগত দুষ্কৃতকারীদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ্দীতে প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নটি যেমন হাস্যকর, তেমনই অবাস্তব। দেশের ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মূল উৎস কোথায় তা অবগত রয়েছে। শুধুমাত্র সদিচ্ছা ব্যক্ত করে কোন কাজ হবে না। কঠিন শাস্তির ভয় দেখালেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটবে না। সন্ত্রাসী ভূত তাড়াতে হলে শুদ্ধি আন্দোলন করতে হবে। যে সব দলের আর্মড ক্যাডার রয়েছে তাদের উচিত এই শুদ্ধি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা। শুদ্ধি আন্দোলনের অর্থ হলো নিজ দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্রকর্মীদের অস্ত্র বিমুক্ত করা।"

জেদাজেদি করে এই সমস্যার সমাধান করা মোটেও সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কিংবা অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্র রাজনীতির সাথে অস্ত্রের কোন যোগাযোগ নেই। এই চিরন্তন কথাগুলোকে মেনে চলতে হবে। নতুন কিছু জোর করে করতে গেলে পরিণতি কি হয় তাতো আমরা দেখছি। মৃত্যুর প্রতিযোগিতায় আমরা অংশ নিতে পারি না।

আমরা সরকার ও অপোজিশান বুঝি না। আমরা বুঝি যে, সরকার এবং নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে এমন একটি ঐকমত্যে উপনীত হোক, বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর কোন অস্ত্র ঢুকবে না। যারা ৩২ নম্বর ঘেরাও করতে চান তারা উস্কানিদাতা। তাদের দ্বারা দেশের কোন কল্যাণ হবে না। ৩২ নম্বরের বাসিন্দা শেখ মুজিব না হলে বাঙ্গালী জাতি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারতো না। ৩২ নম্বরের বাসিন্দা জাতির জনক বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেও আশা মিটেনি।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, মুসলিম লীগের প্রেতাত্মারা বিএনপি'র ঘাড়ে চেপেছে। সরকার পরিচালনায় যোগ্যতার দরকার। এরকম সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার প্রশ্নে বেগম খালেদা জিয়া যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করেছেন, সেই কঠোর ব্যবস্থা বাস্তবায়নে আর কত দেরী? আমরা সরকারের কথা ও কাজে মিল দেখতে চাই। পাকিস্তান সরকার রক্তচক্ষু দেখিয়ে আওয়ামী লীগকে শায়েস্তা করতে পারেনি। আইয়ুব খান বলেছিলেন, আওয়ামী লীগের সাথে 'ল্যাংগুয়েজ অব ওয়েপন'-এর মাধ্যমে কথা বলবেন। শেষ পর্যন্ত যারা এসব কথা বলেছে তারা নিজেদের অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলেছে। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত একটি স্বাধীন জাতির নির্মাতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইতিহাস পাল্টানো যায় না। কাজেই যারা লাগামহীন কথাবার্তা বলছেন, তাদের উচিত রাজনৈতিক নরমস অনুসরণ করা। রাজনীতিতে নরমসের গুরুত্ব সর্বাধিক।